

পরীক্ষায় যারা ফেল করেছে বা করবে

সফলতা - ব্যর্থতা

তাজুল ইসলাম

গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। এই ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ হতাশা, গ্লানি, ক্ষোভে আত্মহত্যা করছে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। কৈশোরে-তারুণ্যে আত্মহত্যার একটি অন্যতম কারণ পরীক্ষায় ফেল করা। জীবন কখনোই কারও জন্য কেবলই কমেডি ছিল বা থাকবে তেমনটি নয়, মাঝেমধ্যে ট্রাজেডিও নেমে আসে।

জীবন হচ্ছে সফলতা-ব্যর্থতার পালাবদলের এক অবিরাম ধারা। কোনো একটি কাজে ব্যর্থ হওয়া মানে শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এ জন্য আত্মহত্যা করাটা বোকামি। পরীক্ষায় ব্যর্থতা বা যেকোনো ব্যর্থতার পর কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কেউ তীব্র নেতিবাচক আবেগে বিক্ষোভিত হয় (এরাই আত্মহত্যার চেষ্টা নেয়), আবার কেউ সাময়িক আপসেট থাকে মাত্র। কে কোন ধরনের আবেগীয় প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তা অনেক দেহ-মনো-সামাজিক কারণের ওপর নির্ভর করে।

যারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বা হবে, তাদের মনে রাখা ভালো, পৃথিবীর অনেক সফল, বিখ্যাত ব্যক্তি পড়াশোনায় তেমন ভালো করতে পারেননি। তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন, স্টিভ জবস, বিল গেটস, এমনকি আইনস্টাইন।

যারা ফেল করেছে বা করবে, তাদের করণীয় যারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বা হবে, তাদের যা যা করতে হবে:

১. অতিরিক্ত আতঙ্কিত হবে না—এটিই জীবনের শেষ নয় এবং তুমি একা ব্যর্থ হওনি। আরও অনেক পথ খোলা রয়েছে।

২. ব্যর্থ হলে হতাশ হওয়া, বিপর্যস্ত হওয়া, রাগ, ক্রোধ, গ্লানি, অপমানে জর্জরিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এ 'শোক' সয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে কিছুটা সময় দাও—ত্রেক নাও। সময় সব ক্ষতের উত্তম মলম।

৩. তুমি এখন খুবই খারাপ অনুভব করছ। নিশ্চয় চাইবে না ভবিষ্যতেও তেমন খারাপ কিছু ঘটুক। তাই বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে ঘটনাটি পুনর্মূল্যায়ন করো, সজনশীলভাবে চিন্তা করো, আমি যেমনটি চাই, তেমনটি পেতে হলে আমাকে কী কী করতে হবে?

৪. কোনো একটি ব্যর্থতা দিয়ে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করবে না—ব্যর্থতা একটি ঘটনামাত্র। কোনো মানুষ ব্যর্থ নয়, তার কিছু চেষ্টা, কাজ ব্যর্থ হতে পারে।

৫. যদি তুমি দেখাতে পারো, যেকোনো ব্যর্থতাকে তুমি মোকাবিলা করতে পারো, তাহলে কেউ মনে রাখবে না যে তুমি ব্যর্থ হয়েছিলে।

৬. কিছু ঘটনাকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারো না বটে, কিন্তু সেটি কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবে

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য
অর্জনের জন্য
সন্তানদের অধ্যবসায়ী
হওয়ার শিক্ষা দিতে
হবে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও,
প্রবল বাধা,
প্রতিকূলতা সত্ত্বেও,
বছরের পর বছর
ধরে চেষ্টা চালিয়ে
যাওয়া এবং
অব্যাহতভাবে
জীবনসংগ্রাম চালিয়ে
যাওয়ার মানসিকতা
যাতে গড়ে ওঠে সেই
শিক্ষা দিতে হবে

এবং এর প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কী ধরনের হবে, সেটি তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো।

৭. নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে না—পরিবারের লোক, বন্ধুবান্ধব সবাই সঙ্গে সংযোগ রাখো। গ্লানি, অপমান, কষ্ট চাপিয়ে রাখবে না। প্রিয়জনদের সান্নিধ্য থাকো। নিজের ওপর যেমন নির্ভর করবে, তেমনই গুণ্ডাকাঙ্ক্ষীদের ওপরও নির্ভর করো।

৮. নিজের যত্ন নাও—যা ভালো লাগে করো, সামাজিক যোগাযোগ বাড়িয়ে দাও, ভালো ঘুম দাও, পুষ্টিকর খাবার খাও, ব্যায়াম করো। কোথায় ও কার কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

৯. আবেগকে 'বোতলবন্দী' করে রাখবে না। এগুলো যথাযথভাবে প্রকাশ করো।

১০. ভাবো, তুমি একাই কি হেরেছ? এই হারার জন্য সবাই কি তোমাকে অপছন্দ করছে, অবজ্ঞা করছে, তিরস্কার করছে বা দূরে সরিয়ে দিয়েছে? খেয়াল করলে দেখবে, অনেকেই তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী।

১১. ঘটনাকে ভয়াবহ রূপ দেবে না—কোনোভাবেই আমার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয় বা নিজেকে অতিরিক্ত দোষারোপ করবে না।

১২. এত ভগ্নমনোরথ অবস্থায়ও আশাবাদী হও। আশঙ্কা, ভীতির দিকে নজর না দিয়ে যা অর্জন করতে চাও, তার একটি ইতিবাচক মন-ছবি তৈরি করো।

১৩. ব্যর্থতার কারণ নিয়ে ভাবো—যা ঘটেছে, বিস্তারিত সব লেখো, সম্ভাব্য সমাধান

কী, খুঁজে বের করো ও কী কী বাধা আসতে পারে, তা-ও লেখো।

১৪. ঘটনার পরও জীবন চলবে—ব্যর্থ হয়েছে, তার মানে কেয়ামত হয়ে যায়নি। জীবন-জগৎ আগের মতোই চলবে। তুমি পরিবর্তিত হবে, জীবন পরিবর্তিত হবে—কিছুই এক রকম থাকবে না। একই রকমভাবে তোমার এই দুঃসময়ও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সামনে তাকাও, উঠে দাঁড়াও, অল্প করে হলেও চলতে থাকো।

১৫. অনলাইনে বিভিন্ন পেজে মানসিক সহায়তামূলক লেখা থাকে, সেগুলো পড়ে দেখতে পারো (ফেসবুকে 'বি পজিটিভ বি হ্যাপি' নামে আমাদের একটি গ্রুপ আছে। আমরা নিয়মিত সেখানে অনুপ্রেরণামূলক পোস্ট দিয়ে থাকি)।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ব্যর্থতা, বিপর্যয়ে যাতে আমাদের সন্তান সহজে মুগ্ধ না পড়ে, ভেঙে না পড়ে, সে জন্য তাদের মানসিক কাঠামো সবল, দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে; হতাশা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়াতে হবে; মানসিক নমনীয়তা বাড়াতে হবে এবং আঘাত পাওয়ার বা বিপর্যয়ের পর দ্রুত উঠে দাঁড়ানোর, ঘুরে দাঁড়ানোর মতো সক্ষম হতে হবে। এর জন্য অভিভাবকদের যা যা করতে হবে:

১. সন্তানের যত্ন নিতে হবে। তাদের সহায়তামূলক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে।

২. এমন কিছু করা যাবে না, যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। বাইরের পরিবেশে মিশতে দিতে হবে, যাতে তাদের যোগাযোগের দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ে এবং তীব্র আবেগ ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা তৈরি হয়।

৩. দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সন্তানদের অধ্যবসায়ী হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। ব্যর্থতা সত্ত্বেও, প্রবল বাধা, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং অব্যাহতভাবে জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা যাতে গড়ে ওঠে সেই শিক্ষা দিতে হবে।

৪. মা-বাবা, পরিবারের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের মধ্যে বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত জিপিএ-৫ পাওয়া, পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার মতো অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় লক্ষ্য আমরাই তাদের মানসে সেট করে দিই। এগুলো বাদ দিতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতি সন্মুখী ইতিবাচক পুনর্মূল্যায়নে সহায়তা করতে হবে সন্তানদের। পরীক্ষায় ফেল করার পর হতাশ সন্তানদের কতজন ইতিবাচক মূল্যায়নে সহায়তা করেন? যদি নিজেরা সমর্থ না হন, অভিভাবকদের কাছে নিয়ে যান।

৫. এবং সর্বোপরি সন্তানের মানসিক দৃঢ়তা-কাঠিন্য তৈরি করা দরকার। প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা করবে।

● তাজুল ইসলাম, সোশ্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়র সহকারী সোশ্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
নিম্নোক্ত এনালিস্ট
drtazul84@gmail.com

প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/স্বাক্ষর	